আলপনায় প্রতিফলিত নারীমনস্তত্ত্ব

ফারহানা ফেরদৌসী*

সারসংক্ষেপ : আলপনা বাংলা ভূ-ভাগে সাড়ম্বরে সমাদৃত বহুবর্ণিল লোকসংস্কৃতির অকৃত্রিম অঙ্গ, যার সঙ্গে গ্রামীণ বাঙালি সমাজের সম্পর্ক বহুকাল ধরে প্রবহমান। এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের রূপরেখা অনুধাবনের সহায়ক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে ও লোকমানসের প্রামাণ্য ভাষ্য হিসেবে আলপনার গুরুত্ব অপরিসীম। মাঙ্গলিক এ রেখাচিত্রে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। গ্রামীণ সনাতন নারীসমাজের আচরিত ধর্মানুষ্ঠান তথা ব্রতকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে প্রচলিত এ লোকশিল্প এখনো সাড়ম্বরে টিকে রয়েছে। শুধু তাই নয়, একুশ শতকের আধুনিক নাগরিক জীবনব্যবস্থায় সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর আবেদন, বিস্তার ও প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই নতুন তাৎপর্যে উন্নীত হয়েছে। এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে আলপনায় প্রতিবিম্বিত নন্দনভাবনার সমাহার, যা একইসঙ্গে লোকসমাজের বৈষয়িক-সাংস্কৃতিক উপযোগিতা ও শিল্পরুচির পরিচায়ক। নারীচর্চিত এ লোকশিল্পের বৈচিত্র্যময় পরিমণ্ডলে বিন্যস্ত হয়েছে নারীমনস্তত্ত্বের অকথিত অধ্যায়, যার পাঠগ্রহণ শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, আবশ্যকও।

অন্তরের লালিত সুকুমার বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিশীল মানুষমাত্রেরই স্বভাবজাত প্রবণতা। কেননা, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আত্মপ্রকাশের তাগিদ। এরই পরিণতিতে মানুষের চেতনালোকে জাগে সুন্দরের প্রতি বিমুগ্ধতা। কল্পলোকের ভাবনাকে নিজের জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিচিত্র আধারে রূপায়িত করার আকুতি শিল্পীর একান্ত অভিপ্রায়। এভাবেই শিল্পের জন্ম হয়, সৃষ্টিশীলতার প্রতি শিল্পীর আন্তরিকতা, মনোযোগ ও সামর্থ্য গুণগ্রাহীর নজর কাড়ে। আলপনা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটি সর্বজনসমাদৃত লোকশিল্প, যা বহুকাল ধরে প্রচলিত। আলপনার বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে জানা যায়, আদিম লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সংস্কার ও ধর্মচিন্তাকে উপজীব্য করে যুগ যুগ ধরে এর প্রবহমানতার ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে ধর্মচর্চার সঙ্গে এর

* সহকারী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.7

সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[১] নারীচর্চিত লোকশিল্প হিসেবে আলপনা ছাড়া অন্য কোনো লোকশিল্পে নারীমনস্তত্ত্বের বিশিষ্ট রূপ যথেষ্ট গুরুত্বসহযোগে প্রতিবিম্বিত হয়নি। প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম ও বিবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে ধর্মকে অবলম্বন করে সংসারী মানুষ, বিশেষত অন্তঃপুরের বাসিন্দারা নিজের ও পরিবারের প্রিয়জনের, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কল্যাণসাধনে বিভিন্ন রীতি-নীতি ও আচার পালনে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তাদের চেতনালোকে সন্নিহিত শিল্পভাবনাও বহুলাংশেই আলপনাকে কেন্দ্র করে বাঙ্ময় রূপ পায়। রেখাচিত্রের অন্তর্গত এবং মাঙ্গল্যচিত্র হিসেবে বিবেচিত আলপনাকে প্রদ্যোত ঘোষ[২] একমাত্র 'যোষিৎ লোকশিল্প' (প্রদ্যোত, ২০০৪ : ৮২) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সৌন্দর্যের উপলব্ধি আদিম অরণ্যচারী মানুষের নিকট যথেষ্ট স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ত ছিল না একালের শিল্পরসিক সমঝদারের মতো। কিন্তু তারাও যে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও প্রতিবেশের বিভিন্ন উপকরণে একে অনুধাবন করতে সচেষ্ট ছিল, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতায় আবিষ্কৃত গুহাচিত্র, লোকচিত্র ও ভাস্কর্যে। আর আদিম অরণ্যচারী সমাজ ও শিকারনির্ভর আদিবাসী সমাজের ব্যাপ্তি পেরিয়ে কৃষিজীবী লোকসমাজের অন্তর্গত অন্তঃপুরবাসীর কাছে আলপনার আবেদন ইহলৌকিক প্রয়োজনের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে নিজস্ব কল্পনা, সাধ-আহ্লাদ ও সৃষ্টিশীলতাকে রূপায়ণের মাধ্যম হয়ে ওঠে এর বহুমাত্রিকতাগুণে।

১.১

আলপনা অঙ্কন যৌথ বা সমবেত প্রয়াস, যা বহুলাংশেই সনাতন গ্রামীণ নারীদের ধর্মীয়, পারিবারিক, লৌকিক ও সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গিকে ধারণ করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের আলপনা অঙ্কনকে 'সখীপনা'[৩] হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ নামকরণে সন্নিহিত রয়েছে পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীর অন্তর্গত নারীদের আন্তরিক সম্পর্কের বন্ধনগত শিল্পকর্ম সম্পাদনের প্রয়াস। গ্রামের নারীরা বাড়ির উঠান ও মেঝেতে, দেয়ালে, এমনকি বিভিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী যথা ভাঁড়, সরা, ঘট, বাটি ও বসবার পিঁড়ি-পাটিতে উৎসব-পার্বণ, পূজা, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং সর্বোপরি ব্রত উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আলপনা আঁকে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে আলপনার সংযোগ নেই। বরং পরিবারের বয়স্ক নারী অভিভাবক-আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বালিকারা এটি অঙ্কনের দীক্ষা গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বংশপরম্পরায় ধারণ ও সম্প্রসারণের সামর্থ্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলপনার বিবর্তনগত চালচিত্র থেকে তা জোরালোভাবে অনুধাবন করা যায়। এটি বিশেষভাবেই অনুষ্ঠাননির্ভর লোকচিত্র, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহ ও পরম্পরাকে ভিত্তি করে রঙ-রেখার বিন্যাসে নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ফুটে ওঠে। ফলে লোকসংস্কৃতির পাঠ গ্রহণের অনুষঙ্গে বাঙালি নারীর একান্ত ভাবনা-আবেগ-অনুভব, কল্পনা ও বিশ্বাস-সংস্কার অনুধাবনে

এটি প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়। সনাতন হিন্দু সমাজে আলপনা ধর্মীয় ভাবনার বিশিষ্ট অবলম্বন হলেও মুসলমান সমাজে এর উপস্থিতি লক্ষণীয় বিশেষভাবেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়োজন ও উৎসবকে আশ্রয় করে।[৪] আলপনা আঁকার মূলে একদিকে যেমন প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও সাংসারিক ভাবনা নারীমনে সক্রিয় থেকেছে, অন্যদিকে অন্তর্গত শিল্পবোধ ও নান্দনিকতার প্রতি আগ্রহও তাকে চালিত করেছে এর প্রতি অভিনিবেশে। ব্রতের অঙ্গ হিসেবেই প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি লোকসমাজে আলপনার চর্চা সম্প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, সনাতন ধর্মের প্রথাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রীয় আচারের অংশ হিসেবে নয়, বরং গ্রামবাংলার নারীমহলে আচরিত বিভিন্ন লৌকিক ব্রতের অঙ্গ হিসেবেই আলপনার ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্দেশিত।[৫] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১৯) তিনি ব্রতের সঙ্গে ছড়া ও আলপনার অঙ্গাঙ্গী সম্পৃকতা নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ২১) ব্রত ও আলপনা যে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত, তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, "বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ২৮) নিছক ধর্মাচার পালনের মাধ্যমে প্রত্যাশাকে বাস্তবায়নের অভিপ্রায় থেকেই নয়, বরং গ্রামবাংলার নারীরা সৌন্দর্যপ্রীতি ও অন্তর্গত সুকুমার বৃত্তি লালনের প্রচেষ্টা থেকেও আলপনায় তার কাম্যবস্তু ও প্রত্যাশাকে চিত্রিত করেছে। প্রদ্যোত ঘোষ জানিয়েছেন, "ব্রতের মূল অর্থ– বরণ করা, প্রার্থনা করা, যেহেতু শব্দটি 'বৃ' থেকে আগত। অর্থাৎ আমরা যা প্রার্থনা করি, যাকে বরণ করতে চাই, পেতে চাই– তারই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতির নাম ব্রত।" (প্রদ্যোত ২০০৪ : ৮৪) লালা রুখ সেলিমের অভিমত, "পরিবার পরিজন সকলের সুখ শান্তি ও মঙ্গল কামনার মধ্যে বাংলার নারী সমাজ যে মানসিক সংস্কৃতি রচনা করেছিল, ব্রত হল তারই এক অভিব্যক্তি, আর আলপনা হচ্ছে এই ব্রতেরই আনুষ্ঠানিক অলংকরণ এবং একান্তভাবেই মেয়েলী শিল্প।" (লালা রুখ, ২০০৭ : ৪৭৮) কামনার সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার যৌথতায় রচিত হয়েছে ব্রত ও আলপনার বিভিন্ন প্রতিরূপ, যা তাদের লৌকিক ভাবনা ও জীবনবোধকে ধারণ করে চলেছে যুগের পরম্পরাকে অঙ্গীকার করে। ব্রত পালনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ছড়া কাটা বা আবৃত্তি, আলপনা অঙ্কন এবং ব্রতকথা পরিবেশন প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম। নারীকেন্দ্রিক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক এ লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও দেশের, এমনকি সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষা। ব্রত, ছড়া ও আলপনার আধারে প্রতিবিম্বিত নারীমনস্তত্ত্বের নিগূঢ় বৃত্তান্ত অনুধাবন প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন–

> পূর্বকালে মানুষ যে-কোনো কারণে হোক মনে করত, যে জিনিস সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিংবা তার প্রতিমূর্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ করবে। সে হিসেবে আলপনার জিনিসটির প্রতিরূপ দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখছি, মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং মনও তৃপ্তি মানছে না যতক্ষণ-না শিল্পসৌন্দর্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা-পরিতৃপ্তির পক্ষে আলপনা সুন্দর হলো কি না হলো তাতে বড়ো আসে যায় না। ... মানুষের মনে কোথায় একটি গোপন উৎস রয়েছে সেখান থেকে এই-সব আলপনা নতুন নতুন এক-একটি সৃষ্টির বিন্দুর মতো বেরিয়ে আসছে। ব্রতের আলপনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ একটি যোগ রয়েছে ... শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বশে যাই করি তাই তো শিল্প হয় না। ... নিজের আনন্দ নানা খুঁটিনাটি কাজে এটা-ওটা জিনিসে ছড়িয়ে যাচ্ছে– এই হলো শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে–এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা–এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদে শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয়, অবস্থাটি হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। ... ব্রতের অনুষ্ঠান, শিল্পের উৎপত্তির অবসর কেমন করে এনে দিচ্ছে সেটা দেখা যাক। ... যা কামনা হলো তাই পেলেম তখনি, এ হলে ব্রত হলো না। আবেগ থাকা চাই–যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। এ হলো ব্রতের মূল কথা। ... ব্রতের আলপনা ব্রতীর কামনার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠল, তার পর সেটা আলপনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হলো, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হলো। আগে কামনা, তার পর আলপনা, তার পর ছড়া, শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস–এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেলে। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৫৯-৬৬)

ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় নারীর জন্য বহুকাল ধরেই গৃহকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন, পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন, ধর্মীয় রীতি-নীতি, অনুশাসন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাবে তাকে বাধ্য হতে হয় পরিবারের পুরুষ অভিভাবকের ওপর নির্ভর করতে। এরই ধারাবাহিকতায় ইহলৌকিক বিভিন্ন চাহিদা, কামনা-বাসনা ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের তাগিদ তার মনোলোকে প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিনির্ভর ও নিয়তিবিশ্বাসী লোকসমাজের বাসিন্দারা বংশপরম্পরায় অনুসৃত প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও আচার-অনুষ্ঠানের ওপর আস্থাশীল। কেননা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় না থাকা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি তাদের সরলরৈখিক চিন্তাধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈরী পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে ঘটে চলা

বাস্তবতাকেই মেনে নেয়া তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সবল পুত্র সন্তানের জন্মদান, তাকে রোগ-ব্যাধি ও অপদেবতার কবল থেকে দূরে রাখার প্রত্যাশা, স্বামী-সন্তান-পরিজন নিয়ে আজীবন সুখে-শান্তিতে বসবাস করবার আকাঙ্ক্ষা, অর্থ-সমৃদ্ধির বাসনা ইত্যাদি বাঙালি নারীর সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন ব্রত পালনের বিশেষ কারণ। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেমন আছে শুভবোধ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, তেমনি আছে শত্রু নিপাতের কামনা; যাতে জীবন চলার পথ হয় সহজ ও বাধামুক্ত। সেকারণেই বিভিন্ন লৌকিক ব্রতকথায় জাদু, বিশ্বাস, স্বপ্ন, কল্পনার সঙ্গে প্রাত্যহিক গ্রামীণ লোকজীবনবাস্তবতার অভিন্ন সমাবেশ লক্ষণীয়। আদিত্য মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন–

> বাঙালির জীবনে ব্রত পালন, আলপনা আঁকা সম্ভবত প্রাক-বৈদিক রীতি। ... গ্রামীণ জনজীবনে বিশেষভাবে নারীদের ভেতর ব্রত পালনের প্রথা আজও গভীরভাবেই বর্তমান। সেখানে জাদুশক্তি, প্রজননশক্তি, কৃষিশক্তির আরাধনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ... মূলত প্রজনন শক্তির পূজোরূপে, কৃষিলক্ষ্মীর পূজো হিসেবে এবং নানা অশুভ শক্তির বিনাশ বাসনায়, শুভের প্রতিষ্ঠায় তথা সম্মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্রত পালন থেকে জাদুবিশ্বাস ও আলপনা এঁকে তার প্রতিষ্ঠা এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ ছিল ... গ্রামীণ নারীসমাজের প্রায় নিজস্ব অনুষ্ঠান। ... ষষ্ঠীব্রত, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী ব্রত, কোজাগরী ব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ব্রত, অশোকষষ্ঠী-শীতলষষ্ঠীর ব্রত, ধর্ম ঠাকুরের ব্রত, নীলষষ্ঠীর ব্রত, চড়কের ব্রত, গাজন-গম্ভীরার ব্রত, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার ব্রত, এমন অজস্র ব্রত-পার্বণ রয়েছে যার উৎসস্থল অবশ্যই বাংলার আদিম কৌম সমাজ। সেই সমাজের পালনীয় বহু ক্রিয়াকলাপই আজ সর্বক্ষেত্রে গৃহীত। আলপনা যার অন্যতম বিশিষ্ট এক মাধ্যম। (আদিত্য, ২০১৪ : ৩১১-৩১২)

আদিম সমাজে প্রকৃতিনির্ভর অরণ্যচারী মানুষ নিজের অসহায়ত্ব অনুধাবন করে একপর্যায়ে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে বাঁচবার তাগিদে তারা সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও ব্রত। প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পেতে তাদের সহায়ক অবলম্বন ছিল ব্রতানুষ্ঠান। "আদিম সমাজের মানুষের ধর্মধারণাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে। ... ভয় ও বিপদ থেকে বাঁচবার তাগিদেই মানুষ কল্পনাশক্তিকে আশ্রয় করে। আদিম সমাজে ছিল না কোনো শিক্ষা দীক্ষা। তাই তাদের মনে বিপদের সময় স্বাভাবিকভাবেই বন-জঙ্গল, প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেই ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার ভরসায় মানুষ ভক্তিভরে পূজা করে রুষ্ট দেবতাকে।" (কনকরঞ্জন, ২০০৯ : ৭৮) সেকারণেই বিভিন্ন দেব-দেবী, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার, তাদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণের মানসিকতা লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। ঋতুর পরিক্রমায় বিভিন্ন বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা-মড়ক-দুর্ভিক্ষ-খরা-দাবদাহ প্রভৃতির প্রকোপে সাংসারিক জীবনযাপনের বিঘ্ন ঘটা, দুর্ঘটনা ও রোগের প্রকোপ, মৃত্যুর বিভীষিকা

প্রভৃতি নারীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। ফলে এসবের দাপট থেকে মুক্তি পেতে বুদ্ধি-বিবেচনামাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে তৎপর হতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তার মনোলোকে ব্রত ও আলপনায় লালিত শুভ-কল্যাণাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি অশুভ-অকল্যাণকে বিতাড়ন ও এর কবল থেকে পরিবার-গোষ্ঠী-সমাজকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানযোগে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কন্যা-স্ত্রী-জননী হিসেবে বাঙালি নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা সামাজিক পরিসরে পালনকত্রী, সেবাময়ী, আশ্রয়দাত্রীর হিতাকাঙ্ক্ষী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেকারণেই ব্রত-আলপনাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদিকে ভিত্তি করে তার দায়িতপরায়ণতা, শ্রেয়বোধ ও সৃষ্টিশীল ভাবনা শৈল্পিক আধারে উন্নীত হয়। বাংলা ভূ-ভাগে প্রচলিত ব্রতের বিশেষ অঙ্গ হলো আলপনা। ব্রতের কামনা ভেদে আলপনায় পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সূচিত হয়। তাই প্রতিটি ব্রত পালনের জন্য পৃথক আলপনা নির্দিষ্ট থাকে।[৬]

১.২

আলপনা গ্রামীণ বাঙালি নারীর বিশ্বাস-সংস্কার ও মূল্যবোধকে ধারণের অকৃত্রিম শিল্পরূপ হলেও এতে প্রতিফলিত তাদের কামনাগুলো নিতান্তই স্থূল, সরল ও একরৈখিক নয়। বরং বহুমাত্রিক অর্থদ্যোতকতা, ভাববৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা রঙ ও রেখার অবয়বে এতে পরিস্ফুট হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীকী তাৎপর্য ও ইঙ্গিতে তাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা এতে প্রতিফলিত হয়। এর অন্যতম কারণ লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত আদিম চিন্তাধারা ও ধর্মভাবনার সঙ্গে জাদুর নিবিড় সংযোগ, যার মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো অভীষ্ট কাজে সাফল্য অর্জন। জাদু সম্পর্কিত ধ্যানধারণা সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকেই প্রকৃতিনির্ভর, অলৌকিক-অতিপ্রাকৃত শক্তিতে আস্থাশীল, নিয়তিবিশ্বাসী মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে। একদিকে অশুভ শক্তিকে পরিবার-গোষ্ঠী-সমাজ থেকে বিতাড়িত করার তাগিদ, অন্যদিকে প্রিয়জনদের নিয়ে নিশ্চিন্ত-নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবিকাসংক্রান্ত) প্রাচুর্য ছিল তার একান্ত কাম্য। আলপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নকশা বা মোটিফ অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে,[৭] বহু প্রাচীনকাল থেকে আলপনা আঁকার রীতি অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। কেননা, তারা কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল। অধিক ফসল ফলানোর জন্য বীজ বপনের জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে পাকা ফসল কেটে গৃহে আনা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তারা নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। অপদেবতার কুনজর ও চক্রান্ত থেকে ফসলের মাঠ ও গোষ্ঠীগত পরিমণ্ডলকে মুক্ত রাখা এবং উৎপাদিত ফসলের প্রাচুর্য কামনায় তারা যেসব ধর্মাচার মান্য করত, আলপনাও এর অঙ্গীভূত ছিল। ব্রতানুষ্ঠান পালনের জন্য আলপনা দিয়ে ব্রতস্থানকে চিহ্নিত করার

অন্তরালেও জাদুর ভূমিকা স্বীকৃত। নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, "ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া ব্রতস্থান নির্বাচন করিয়া লওয়া হয়; এই সীমা রেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।" (নীহাররঞ্জন, ১৪০০ : ৪৮৪) আদিত্য মুখোপাধ্যায় মনে করেন,[৮] বাংলার ধর্মাচারের সঙ্গে যুক্ত আলপনা কৃষিজীবনসম্পৃক্ত ছিল। আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার বহু পূর্বেই অস্ট্রিক জাতি কৃষি সম্পর্কিত প্রজনন বা বীজের অঙ্কুরোদগমে আলপনা ব্যবহার করেছে। পরবর্তীকালে ব্রত-উদ্‌যাপনের সূত্রে আলপনার ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অধিক শস্য পেতে, অশুভ ভূত-প্রেত-উপদেবতাকে তাড়াতে জাদুক্রিয়ায় বিশ্বাসী অস্ট্রিক জাতিই সম্ভবত প্রথম 'আইলপনা'[৯] এঁকেছে। আদিত্য মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলায় মেয়েলি প্রথায় বরণের যে স্ত্রী-আচার, ছড়া কাটা, আলপনা দেয়া প্রভৃতিতে জাদুবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে,[১০] যাতে প্রতিবিম্বিত মূল বার্তা হলো অশুভ শক্তির বিতাড়ন ও এর কবল থেকে ঘর-সংসার ও পরিজনকে রক্ষা করা।

> বাঙালির জীবনে ব্রত পালন, আলপনা আঁকা সম্ভবত প্রাক্-বৈদিক রীতি। ... গ্রামীণ জনজীবনে বিশেষভাবে নারীদের ভেতর ব্রত পালনের প্রথা আজও গভীরভাবেই বর্তমান। সেখানে জাদুশক্তি, প্রজননশক্তি, কৃষিশক্তির আরাধনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ... মূলত প্রজনন শক্তির পূজোরূপে, কৃষিলক্ষ্মীর পূজো হিসেবে এবং নানা অশুভ শক্তির বিনাশ বাসনায়, শুভের প্রতিষ্ঠায় তথা সম্মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্রত পালন থেকে জাদুবিশ্বাস ও আলপনা এঁকে তার প্রতিষ্ঠা এবং সীমানা চিহ্নিতকরণই ছিল ... গ্রামীণ নারীসমাজের প্রায় নিজস্ব অনুষ্ঠান। ... ষষ্ঠীব্রত, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী ব্রত, কোজাগরী ব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ব্রত, অশোকষষ্ঠী-শীতলষষ্ঠীর ব্রত, ধর্ম ঠাকুরের ব্রত, নীলষষ্ঠীর ব্রত, চড়কের ব্রত, গাজন-গম্ভীরার ব্রত, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার ব্রত, এমন অজস্র ব্রত-পার্বণ রয়েছে যার উৎসস্থল অবশ্যই বাংলার আদিম কৌম সমাজ। সেই সমাজের পালনীয় বহু ক্রিয়াকলাপই আজ সর্বক্ষেত্রে গৃহীত। আলপনা যার অন্যতম বিশিষ্ট এক মাধ্যম। (আদিত্য, ২০১৪ : ৩১১-৩১২)

ব্রতের সঙ্গে আলপনার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেননা ব্রতানুষ্ঠানকে একইসঙ্গে মাঙ্গলিক ও নান্দনিক করে তোলে বিভিন্ন প্রতীকাশ্রিত আলপনা। এতে ব্যবহৃত বিভিন্ন আদিম বিশ্বাসজাত প্রতীকে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে বাঙালি নারীর আকাঙ্ক্ষা-কামনার চালচিত্র। পল্লব সেনগুপ্ত আলপনায় সংগুপ্ত প্রতীকী ব্যঞ্জনার সঙ্গে জাদুর নিবিড় সম্পকর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আলপনায় মানবসভ্যতার অতীতকালের সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিবর্তনগত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি ও এর ভগ্নাবশেষ লুকিয়ে আছে। কারণ বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও প্রতীকী চিত্র আঁকার প্রবণতা গুহাচিত্র থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুহাচিত্রে, অন্যান্য শিল্পকর্মে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের অঙ্কিত বাস্তবানুগ ও প্রতীক-সংকেতধর্মী যেসব চিত্র ও চিহ্ন দেখা যায়, অনুরূপ দৃষ্টান্ত আলপনাতেও লক্ষণীয়।

> আদিম প্রপিতামহরা তাঁদের শিল্পকলা-চর্চার লব্ধফল হিশেবে 'সুপ্ত' জাদুশক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা ঘটাবে, এমনই মনে করতেন। শিকারের ছবি আঁকলে বাস্তবেও অনুরূপ শিকারের ব্যাপার সংঘটিত হবে, কিংবা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-প্রতীক আঁকলে বিশেষ-বিশেষ ধরনের কামনা/প্রত্যাশার পরিপূরণ হবে– ইত্যাদি মর্মে তাদের যেসব ধ্যান-ধারণা ছিল, তা-ই প্রবর্তিত হয়েছে আলপনার ক্ষেত্রেও: ধানের ছড়া আঁকলে ফসলক্ষেত্রে ধান উপ্‌ছিয়ে পড়বে, মাছভর্তি পুকুর আঁকলে সত্যিকারের পুকুর মাছের ছানাপোনায় ভরে যাবে, বাড়ি, মরাই, গাছ, ভরন্ত নদী, উড়ন্ত পাখি ইত্যাদির ছবি আলপনায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবেশ তৈরি হবে – এমন সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনাই লুকিয়ে রয়েছে সেটি রচনার প্রেরণার আড়ালে। স্পষ্টতই এটা হল সাদৃশ্য বা অনুকৃতিমূলক জাদু সম্পর্কে বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। (পল্লব, ২০১০ : ২৮২)

১.৩

আলপনায় রূপায়িত বিভিন্ন নকশায় প্রতিবিম্বিত হয় গ্রামীণ বাঙালি লোকজীবনসংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গরাজি। এসবের সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন চাহিদা ও কামনার রয়েছে নিবিড় যোগ। নিজের ও পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, যৌনতা-উর্বরতা, বিয়ে করে সংসারযাপন ও সন্তানধারণের মাধ্যমে প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদ, সতীত্ব রক্ষা ও আজীবন সধবা থাকার আকাঙ্ক্ষা, বৈষয়িক উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি, জমিতে প্রচুর ফলনের প্রত্যাশা ও কৃষিকর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গকে এসব প্রতীকের মাধ্যমে আভাসের প্রচেষ্টা নারীসমাজে লক্ষণীয়। ব্রতের কামনাভেদে আলপনার নকশায় যেমন ভিন্নতা দেখা যায়, তেমনিভাবে বিভিন্ন নকশায় বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি ব্রতের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আলপনা নির্দিষ্ট থাকে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন আলপনায় উপজীব্য নকশাকে আটটি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। "প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডন ও পাড়। তৃতীয়, গাছ ফুল পাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদ নদী ও পল্লী জীবনের দৃশ্য। পঞ্চম, পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ, চন্দ্র, সূর্য গ্রহ নক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানাপ্রকার আসবাব। অষ্টম, পিঁড়িচিত্র।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৬২-৬৩) বরুণকুমার চক্রবর্তী বিভিন্ন আলপনার উল্লেখযোগ্য নকশা হিসেবে পদ্ম, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের গুচ্ছ, পদ্ম, ষষ্ঠীর পুতুল, সর্পিল ও বৃত্তাকার রেখা, পেঁচা, কলাগাছ, ফুলগাছ, উদীয়মান সূর্য, নৌকা, রথ, কল্কা, নানাবিধ পার্থিব সম্পদ যেমন– গয়না, গোলাবাড়ি, তৈজসপত্র ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।[১১] বাংলার গ্রামীণ প্রতিবেশের প্রভাব ও উপস্থিতি এসব নকশায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যার সঙ্গে লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুধাবন করা চলে।[১২]

বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাদের বাহন আলপনায় বিশেষ গুরুত্বযোগে উপস্থিত থাকে। এছাড়া গ্রামীণ বাঙালি লোকগোষ্ঠীর নিত্যব্যবহার্য সাংসারিক সামগ্রীও প্রতীকের

আধার হিসেবে নারীমনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলে। পল্লব সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, আদিম চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার অনুভাবনায় নারীমূর্তির মাতৃত্ববাচক প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। গর্ভবতী নগ্ন নারীমূর্তির চোখ-মুখ-নাক ইত্যাদি অস্পষ্টভাবে রূপায়িত হলেও নারীবৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্যঙ্গগুলি স্পষ্ট অবয়ব পেতো। এসব ভাস্কর্য প্রত্নপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাঁর মতে, "মাতৃকামূর্তির প্রতীকী রূপান্তর ঘটল নানাভাবে : যার একটা হল আমাদের আলপনা শিল্পের 'কোলে-পো-কাঁখে-পো' ধরনের চিত্রমূর্তি। পক্ষান্তরে, স্ত্রী প্রত্যঙ্গের প্রতীক ব্যঞ্জনা নিয়ে চিত্রায়িত হতে লাগল পুষ্পল অলংকরণ, বিশেষত পদ্মফুল। তান্ত্রিক 'যন্ত্র' এবং 'অষ্টদল', 'চৌষট্টিদল', 'শতদল', 'সহস্রদল' প্রভৃতি পর্যায়ের পদ্মপ্রতীক এবং 'মণি-পদ্ম' এর দৃষ্টান্ত।" (পল্লব, ২০১০ : ২৮৩-২৮৪) নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসের সঙ্গে এর প্রতীক-সংকেতধর্মী ব্যঞ্জনা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশিত বিভিন্ন ভাবনারাশি সমন্বিতভাবে গ্রথিত। উদাহরণ হিসেবে নারীকেন্দ্রিক কিছু প্রতীকের উল্লেখ ও এসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো লক্ষ্মী দেবীর পদচিহ্ন। নারীর শান্ত-কোমল-স্নিগ্ধ ও সেবাময়ী ভাবমূর্তির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে গার্হস্থ্য সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, আর্থিক উন্নতি ও পারিবারিক নিরাপত্তাবোধ। বাঙালি সমাজে লক্ষ্মী বলতে সেই নারীকেই বোঝানো হয় যার অনিন্দ্য রূপ, বিনম্র ব্যবহার, সেবা-যত্ন, কর্মকুশলতা ও মিষ্ট বাচনের সম্মিলিত গুণ রয়েছে; যে গৃহবধূ হিসেবে সকল কাজ নিপুণভাবে করতে সমর্থ। এরকম নারী যে পরিবারে থাকে, সমাজে সে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি পায়, বৈষয়িক উন্নতি বিরাজ করে বলে লোকসমাজে ধারণা প্রচলিত। প্রাগার্য যুগের অস্ট্রিক কৃষিজীবী সমাজে জাদুবিশ্বাসের প্রভাবে প্রচলিত নারীর পায়ের ছাপকে সনাতন হিন্দু সমাজ সামাজিক বিবর্তনের একটি পর্যায়ে ব্রতের অনুষঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এর উপস্থিতি মানবজীবনে বিদ্যমান ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সমৃদ্ধি-বিনাশ উভয় ধরনের পরিণতিকেই প্রতীকায়িত করে। (প্রদ্যোত, ২০০৪ : ৮৫) পল্লব সেনগুপ্তের মতে, 'লক্ষ্মীর পদচিহ্ন'কে শুভদ্যোতক বলে মনে করার সূত্রপাত ঘটেছে আদিম কৌমজীবী মানুষের অরণ্যাশ্রিত শিকারনির্ভর জীবন থেকে। তবে উত্তরকৃষি পর্বের পায়ের ছাপকে পবিত্র প্রতীক হিসেবে (অথবা জাদুসংকেত) গণ্য করা হয়েছে, যার প্রমাণ মেলে হরপ্পা-সংস্কৃতির সিলমোহরে ও প্রাচীন ক্রীটদ্বীপের প্রত্ন-অবশেষে। লক্ষ্মী দেবীর পায়ের ছাপ এমনভাবে আলপনায় আঁকা হয়, যাতে তার আঙুলগুলি থাকে ঘরের দরজা থেকে ভিতরে আসার সংকেতবাহী হয়ে। তিনি জানিয়েছেন–

> ঘরের দুয়ারে এভাবে অন্দরমুখী পদচিহ্ন আঁকার পিছনে যে-মানসিকতা আছে, তা হল এই : ঐভাবে আঁকলে শুভকরী দেবতা (এখানে লক্ষ্মী) তার ওপরে পা-ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকবেন; অথবা, তিনি ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকে এসেছেন, পদচিহ্নের মাধ্যমে সেটিই মনে করা হচ্ছে। এই পায়ের ছাপ কখনও বহির্মুখী করে আঁকা হয়

> না, কারণ তাহলে 'লক্ষ্মী ছেড়ে যাবার' সম্ভাবনাটা না-কি প্রবল হয়ে উঠবে! ... অর্থাৎ, সমস্ত ব্যাপারটিই অনুকৃতিমূলক জাদুর প্রতি আস্থা থেকে গড়ে উঠেছে–এই লক্ষ্মীর পদচিহ্ন থেকেই সেটা প্রতীত হয়। পায়ের ছাপের মতো হাতের পাঞ্জা আঁকাও একটি সুপ্রাচীন সংকেতচিহ্ন। গুহার দেয়াল থেকে তার শুরু এবং এখনো আদিবাসী বহুকালের মানুষেরা তো বটেই, এমনকি আদিবাসী স্তর থেকে এগিয়ে এসেছেন তেমন গ্রামীণ মানুষেরাও বাড়ির দেয়ালে–বিশেষত দরজা এবং জানালার পাল্লায় হাতের ছাপ এঁকে রাখেন ... পায়ের ছাপের ঠিক বিপরীত সংকেত এই হাতের ছাপের মাধ্যমে সূচিত হয়। পদচিহ্ন যেমন শুভকারী-অলৌকিক শক্তিকে স্বাগত করে বলে মনে করা হয়, হাতের ছাপ তেমনই আবার অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করে–ভাবনাটা এমনই। (পল্লব, ২০০১ : ৬১-৬২)

নারীদেহের বিশেষ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে পদ্মফুলের প্রতিতুলনায় অনুমান করা চলে, নিছক সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরুচির মানদণ্ডে নয়, বরং যৌনতা ও প্রজননের অবলম্বন হিসেবে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু সভ্যতায় পদ্মফুলের উপস্থিতি শিল্পকলার উপাদানরূপে লক্ষণীয়। তবে তন্ত্রসাধনায় 'যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত অষ্টদলপদ্ম বা বহুদলপদ্মের প্রতীকে নারীযোনিকে নির্দেশ করা হয়েছে। ব্রত ও আলপনায় পদ্মফুলের উপস্থিতি প্রত্যাশা ও কামনাকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় বিশেষভাবেই জাদুবিশ্বাসগত। পাশাপাশি পদ্ম, শঙ্খ-পদ্ম, মঙ্গলপদ্ম, অষ্টদলপদ্ম, দশদলপদ্ম, চরণপদ্ম, পূর্ণকুম্ভ, অষ্টকলসী, মঙ্গলকলসী প্রভৃতি উর্বরাশক্তির প্রতীক। (প্রদ্যোত, ২০১০ : ৮৮) তান্ত্রিক 'যন্ত্র' এবং 'অষ্টদল', 'চৌষট্টিদল', 'শতদল', 'সহস্রদল' প্রভৃতি পর্যায়ের পদ্মপ্রতীক এবং 'মণি-পদ্ম' এর দৃষ্টান্ত। (পল্লব, ২০১০ : ২৮৩) আলপনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন গাছের মাধ্যমে, বিশেষত নারকেল গাছ, কদম গাছ, আম গাছ প্রভৃতির প্রতীকে গর্ভবতী নারীকে প্রতীকায়িক করার প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃক্ষপূজার ধারা ব্রত ও আলপনায় বিবর্তিতরূপে এভাবে একালে উপস্থিত রয়েছে। শীলা বসাক জানিয়েছেন, "শিকারজীবনের পর এল কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, তখন আলপনার প্রতীক বা চিহ্নের চেহারা বা রূপও গেল পালটে। ব্রতের আলপনার মধ্যে অনেকগুলি নকশা বা মটিফ লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল : ধানের শীষ, অলঙ্কার, ফুল, বিশেষত পদ্মফুল, পেঁচা, লাঙল, মই, সিঁদুরের কৌটো, লতা-পাতা, লক্ষ্মীর পা ও ঝাঁপি, পালকি, পাখি, হাতি, ঘোড়া, ঢেঁকি, চিরুনি, সূর্য, পান, কড়ি, কলাগাছ, মাছ, হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ ইত্যাদি।" (শীলা, ২০০০ : ৩৫) অন্যদিকে বিভিন্ন কৃষিজ উপকরণের মধ্যে "ধান্যমঞ্জুরী বা ধানের শিস, ধানের গোলা, গোয়ালঘর, মই, কাস্তে, সূর্য, পেঁচা ইত্যাদি কৃষিসভ্যতার স্তরে অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত শুভ চিহ্ন। শস্যসম্পদ হানিকর মুষিকের (ইঁদুর) শত্রু পেঁচা। তাই সম্পদ রক্ষয়িত্রী লক্ষ্মীদেবীর বাহন হিসেবে পেঁচা নির্দিষ্ট হয়ে আলপনার উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্ম ও কর্মধারায় প্রতীক হিসেবে সৌন্দর্য প্রকাশক রূপ নিয়ে এসেছে।" (প্রদ্যোত, ২০০৪ : ৮৫-৮৬)

প্রদ্যোত ঘোষ আরো জানিয়েছেন, "কলাগাছ, পানপাতা ও কড়ির উল্টোপিঠের অনুসারী কঙ্কানুসারী আলপনার চিহ্ন প্রাগার্য অস্ট্রিক চেতনার যেমন চিহ্নবাহী, তেমনই কলা, পান ও কড়ি তাদের আকার সাদৃশ্যে উর্বরতাদ্যোতক। তাই অথনৈতিক চেতনা এবং সংস্কার – এই দুয়ের অভিপ্রায়ে এই সব উপচার আলপনাতেও স্থান পেল প্রতীক হিসেবে।" (প্রদ্যোত, ২০০৪ : ৮৫-৮৬) শীলা বসাকের অভিমত–

> বঙ্গললনাদের ব্রত পালনের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বাস-সংস্কার-বোধ, ইচ্ছা পূরণের ও মঙ্গলকামনার তাগিদ। ... ব্রতের উপকরণগুলির মধ্যে জলভরা ঘট, ঘটের উপর কচি ডাব এবং ঘটের গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে আঁকা স্বস্তিকা বা পুত্তলি চিহ্ন ইত্যাদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধর্মচিন্তার ঐতিহ্যবহনকারী। মানুষের জীবনের কিছু প্রতীক হিসেবে ব্রতের কিছু উপকরণকে ধরা হয়। ... কলা ও ডাব হল উর্বরতাবাদের প্রতীক। কারণ একটা কাঁদিতে অনেক কলা ও ডাব হয়। ... কড়ি হল ধন-টাকা-পয়সার প্রতীক। পান হল নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীক। আবার জলভরা ঘট এবং কচি ডাব হল অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতীক এবং বিকশিত আম্রপল্লব হল জীবন বিকাশের প্রতীক। ঘটের উপর রাখা ডাবটিও গর্ভেরই প্রতীক। এই ঘট, আম্রপল্লব ও ডাব সব মিলিয়ে এর মধ্যে দিয়ে জীবনবৃত্তের পূর্ণ-প্রতীক ব্যক্ত হয়েছে। আবার যে ধানের গুচ্ছ বা ধানের শীষের উপর ঘটটি রাখা হয় সেই ধানও উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ। ঘটের গায়ে তেল-সিঁদুরে অঙ্কিত মানব মূর্তিটির মধ্যে দিয়ে এটাই বোধগম্য হয় যে এই উর্বরতার গোটা ব্যাপারটাই মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। (শীলা, ২০০০ : ২৮-২৯)

মাছ, সাপ, পাখি প্রভৃতি প্রাণীর উপস্থিতি আলপনায় যথাক্রমে যৌনতা, প্রজনন ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। পল্লব সেনগুপ্তের মতে, "উর্বরতাকেন্দ্রিক ভাবদ্যোতকতা আলপনার বেশ কিছু চিহ্নে বিদ্যমান। মাছ, কড়ি, শাখ, কলাগাছ, পান ইত্যাদি চিহ্ন বাঙালির আলপনায় এসেছে সুপ্রাচীন অস্ট্রিক অধিজাতির উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার হিসেবে। ... আলপনার সূর্যচিহ্নও উর্বরতাসূচক কালচের সূত্রবাহী, বিশ্বজনীনভাবেই সূর্যকে উর্বরতাভাবনায় পুরুষ প্রতীক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। স্বস্তিকা চিহ্ন রূপেও আলপনায় থেকে গেল সূর্য। স্বস্তিকার মতো বসুধারা চিহ্নও উর্বরতার কালচের স্মারক : এ হল বর্ষণের সংকেতবাহী। অতএব কৃষি সমাজের পক্ষে শুভদায়ক অবশ্যই।" (পল্লব, ২০১০ : ২৮৪) আদিম মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-প্রত্নপুরাণ সম্পর্কিত ভাবনা ও ধারণা লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় একালে নতুন চেহারা ও ভাবমূর্তিতে উপস্থিত রয়েছে। পাশাপাশি নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে এসবের পারস্পরিক সংযোগ বিভিন্নভাবে স্বতন্ত্র তাৎপর্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে। মানবজীবনের সবচেয়ে আনন্দময় পর্ব ও সামাজিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বিয়ে' নামক প্রতিষ্ঠানের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। বিয়ের আলপনা দেয়া হয় বর-কনের বসবার পিঁড়িতে, উপহার নিবেদনের

ডালায় ও কুলায়। বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা ও রেখাচিত্র দ্বারা এসব বস্তুকে অলংকৃত করা হয়। তবে সনাতন গ্রামীণ সমাজের বিয়েতে আলপনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেবদেবীর উপস্থিতি প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রদ্যোত ঘোষ "পিঁড়িতেও আলপনা দেওয়া হয় নানা প্রতীকে বা জ্যামিতিক নকশায়। অবশ্য শিল্পীর রুচিভেদে তা পরিবর্তিত হয়। কোন কোন প্রতীক স্পষ্ট করে চেনায় উদ্দেশ্যকে। যেমন– লক্ষ্মীর আসনে শঙ্খ, ইন্দ্রের আসনে বজ্র, অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে নানা ব্যঞ্জনের বাটি অথবা বর-কনের পিঁড়িতে একটি বৃন্তে দুটি কুসুম বা পদ্ম-ভ্রমর। অবশ্য এগুলি খণ্ডিত চিত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রতে যে কামনা-বাসনা সংগুপ্ত থাকে তার রূপ আলপনায় চিত্রিত হয়। সেই চিত্রিত রূপ ছড়ায় ছন্দিত ও ধ্বনিত হয়ে সর্বশেষে ব্রতকথা শ্রবণে তার পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে।" (প্রদ্যোত, ২০০৪ : ৮৯)

১.৪

বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সংসারে নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত। কেননা সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন, পরিবারের সদস্যদের তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন গৃহকর্ম তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি ধর্মীয়-সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান-অনুশাসন মান্য করার মাধ্যমে ইহলৌকিক প্রয়োজন ও পারমার্থিক কল্যাণ অর্জনে তারা সচেষ্ট থাকে। সন্তানকে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষাদানের কাজও তারাই সম্পন্ন করে। ব্রত পালনের মাধ্যমে বাঙালি নারী প্রাত্যহিক জীবনের ধরা-বাধা কাজের গণ্ডিতে বিচরণের ফলে সৃষ্ট একঘেয়েমি ও অবসাদ কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কারণ চিত্তবিনোদনের সহায়ক উপাদান হিসেবে ছড়া আবৃত্তি, ব্রতের কাহিনি বা গল্প শোনা, সঙ্গীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক করা, আলপনা দেয়া বা ছবি আঁকা প্রভৃতির যৌথতায় ব্রতকর্ম পালিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রত, ছড়া ও আলপনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে;–এক কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা। ... বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিম্বা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে– কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে।" [অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ (বঙ্গাব্দ) : ৫৪] নারীর স্বভাবগত প্রবণতা হলো হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ তথা রসিকতার মাধ্যমে আলাপের পরিমণ্ডলকে প্রাণবন্ত করে তোলা। তালে তাল মিলিয়ে, সুর ও ছন্দযোগে মুখে মুখে ছড়া বানানো এবং পরিচিত ছড়াকেই নতুন ভঙ্গিতে পরিবেশনে তার আগ্রহ লক্ষণীয়। ছড়ায় সন্নিহিত রস আনন্দদায়ক ও মধুর, মনকে সহজেই দোলা দেয়। ফলে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সকলেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাশাপাশি ছড়ায় বিধৃত হয় লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার নিপুণ চালচিত্র।[১৩] কালিক বিবর্তনের ধারায় ছড়ায় অতি সামান্য পরিবর্তন ঘটে

বলে কোনো জাতির ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা অনুধাবনে এর প্রামাণ্য ভূমিকা স্বীকৃত।[১৪] গ্রামীণ বাঙালি লোকসমাজের অজস্র প্রসঙ্গ ব্রতের ছড়ায় বিধৃত হয়েছে। সেই সূত্রে লক্ষণীয় যে নারীর আচার-আচরণ, স্বভাবসুলভ বাকপটুত্ব, দেহভঙ্গিমা, ভাষিক প্রবণতা ও সংলাপে প্রতিবিম্বিত হয় তার অন্তর্লৌকিক ভুবনের পরিচয়। রঙ ও রেখায় রূপায়িত আলপনায় এর খানিকটা প্রকাশিত হলেও অনেকটাই অস্ফুট থেকে যায়। ব্রতের[১৫] বিভিন্ন ছড়ায় সেই অনুন্মোচিত মনোজগতের পরিচয় খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়। কাজেই ব্রতের আলপনায় নারীর প্রাত্যহিক জীবনসংলগ্ন চাহিদা ও কামনাবাজির চিত্রময় রূপ যেভাবে প্রকাশিত হয়, এর সঙ্গে ব্রতের ছড়ায় উচ্চারিত চরণ, সুর, তাল ও অন্ত্যমিলের সমাহারে তা আরো স্পষ্ট ও বাঙ্ময় মাত্রায় উন্নীত হয়। এর ইঙ্গিত রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যে – "ব্রতের আলপনা ব্রতীর কামনার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠল, তার পর সেটা আলপনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তার পর আলপনা, তার পর ছড়া; শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস– এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেলে।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৫৯-৬৬) এ পর্যায়ে বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতের ছড়া ও আলপনায় প্রতিবিম্বিত নারীমনস্তত্ত্বের স্বরূপ অন্বেষণে আমরা সচেষ্ট হব।

১.৪.১

গ্রামীণ বাঙালি নারীসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতের মধ্যে সেঁজুতি ব্রত অন্যতম। অগ্রহায়ণ মাসে এ ব্রতের আয়োজন করা হয়। অগ্রহায়ণের শুরু থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় আতপ চালের গুড়া বা পিটুলি দিয়ে নারীরা বিভিন্ন ব্রতের আলপনা আঁকে। সেঁজুতি ব্রতের আবেদন যে নারীসমাজে বহুকাল ধরে চলে এসেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অজস্র ছড়া এবং পঞ্চাশাধিক আলপনার নকশা আঁকার প্রচেষ্টায়। এ ব্রতে ব্রতিনীর বিশেষ কামনা হলো স্বামী-পুত্রের মঙ্গল, পারিবারিক কল্যাণ সাধন, প্রভূত পার্থিব সম্পদ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন। নারীরা এ ব্রত পালনের পর প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে বিবিধ আলপনা আঁকে। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় যেসব নকশা আঁকা হয়, সেগুলো হলো : "১. ষোল ঘর ২. দোলা ৩. কোঁড়া ৪. বেগুন পাতা ৫. শরগাছ ৬. বেনাগাছ ৭. বাঁশের বেড়া ৮. গঙ্গা ও যমুনা ৯. সুপারি গাছ ১০. চন্দ্র ও সূর্য ১১. হাট ঘাট ১২. গোয়াল ১৩. অশ্বত্থ গাছ ১৪. বঁটি ১৫. খ্যাংরা ১৬. শিবমন্দির ১৭. আতা পাতা ১৮. নাট মন্দির ১৯. পাকা পান ২০. তেকোনা প্রদীপ ২১. হাতে পো ও কাঁখে পো ২২. ঢেঁকি ২৩. খাট পালঙ্ক ২৪. ধাতা কাতা ২৫. আম কাঁটালের পিঁড়ি ২৬. ঘি ও চন্দনের বাটি ২৭. পিটুলির সব রকম গয়না ২৮. রান্নাঘর ২৯. ঢেকি কর্কটি ৩০. আর্শী ৩১. উদবিড়ালী ৩২. বেড়ী ৩৩. হাতা ৩৪. পাখী ৩৫. কুলগাছ ৩৬. কাজল ৩৭. নক্ষত্র ৩৮. সিন্দূর চুপড়ি ৩৯. পানের বাটা ৪০. শাঁখ ৪১. ময়না ৪২. দশ পুতুল ৪৩. ইন্দ্র ৪৪. তেরাজ ৪৫.

খট্টাডুমুর ৪৬. ধানের মরাই ৪৭. তালগাছ ৪৮. থুথু ফেলা ৪৯. থৌ ৫০. কুঁচকুঁচুতি ৫১. শিব"। (আশুতোষ, ১৯৬৩ : ৫৪১) এসব আলপনায় অঙ্কিত নকশাগুলি নারীমনের বিভিন্ন ভাবনা, কামনা, প্রত্যাশার প্রতীক। সাংসারিক পরিসরে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা এসবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। শীলা বসাক জানিয়েছেন, "এই ব্রতের আলপনায় চিত্রিত ছবিগুলি যেন এক একটি বিশিষ্ট প্রতীক। এগুলিকে অবলম্বন করে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের এক অকপট অভিব্যক্তি ব্রতের ছড়ার ছন্দে ছন্দে ফুটে ওঠে। আলপনার মাঝখানে ঘট বসিয়ে প্রদীপ জ্বেলে আলপনার প্রত্যেকটি প্রতীকে তিন কিংবা ছয়গাছি করে দুর্বা ধরে ব্রতের ছড়া বলতে হয়"। (শীলা, ২০০০ : ১৪৪)

ক. ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
খ. মার কোলে সোনার তোলা (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
গ. মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা ...
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর
ভাই হয়েছেন রাজা। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
ঘ. আমার ভাই গাঁয়ের বড়। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
ঙ. আমি যেন হই রাজার ঝি ...
আমি যেন হই রাজার বৌ ...
আমি যেন হই রাজার রানী (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৯)

এসব ছড়ায় নারীর নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যদের সম্মান, আভিজাত্যবোধ ও সামাজিক উচ্চ অবস্থান প্রাপ্তির প্রত্যাশা লক্ষণীয়। পাশাপাশি বৈষয়িক উন্নতির কামনাও উচ্চারিত।

ক. বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুরবাড়ি যায়
আসতে-যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায়। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
খ. ওই আসছে টাকার ছালা ...
ওই আসছে ধানের ছালা
তাই মাপতে গেল বেলা। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)
গ. এস নাতি, বস খাটে ...
সোনার ভেঁটা দেব হাতে ...
সাত-ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে। ...

চন্দ্রসূর্য পূজ্যন
সোনার থালে ভূজ্যন। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৯)

এসব ছড়ায় আর্থিক উন্নতি, প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বন্ধনগত সুখী জীবনের অনুষঙ্গ, পারিবারিক সম্পর্কের প্রগাঢ়তা, দীর্ঘায়ু লাভ, সম্মান-প্রতিপত্তিময় সামাজিক অবস্থান, সর্বোপরি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অভিলাষ প্রভৃতি বাঞ্ময় রূপ পেয়েছে।

ক. নাট মন্দির জোড় বাঙ্গালা
দোরে হাতি বাইরে ঘোড়া।
দাস-দাসী, গো মহিষী,
গির্দ্দে আসে পাশে।
রূপ-যৌবন সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে। (শীলা, ২০০০ : ১৪৪)

খ. পাড়া-পড়সী প্রতিবাসী, মৌ বর্ষে মুখে।
জন্ম এয়োস্ত্রী পুত্রবতী জন্ম যায় সুখে।। (শীলা, ২০০০ : ১৪৬)

লোককথার বর্ণিল, কাল্পনিক জগতকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করেছে বাঙালি গ্রামীণ নারীসমাজ। তাই তার কামনা-আকাঙ্ক্ষাও কখনো কখনো লোককথার সুয়োরাণীর অনুরূপ। দিগন্তবিস্তৃত কল্পনা ও প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার ভেদাভেদকে অস্বীকার করে তার মনোলোকে তাই বারবার স্থান পায় জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী দিনযাপনের আগ্রহ ও সামাজিকভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হওয়ার আকুলতা। পাশাপাশি স্বামী তথা প্রিয়মানুষের ভালোবাসাও তার একান্ত কাম্য। এ ধরনের ভাবকে প্রকাশ করেছে পূর্বোক্ত ছড়াগুলো।

রামের মত পতি পাব।
সীতার মত সতী হব॥
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
দশরথের মত শাশুড়ী পাব।
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
কুন্তীর মত পুত্রবতী হব॥
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব॥
দুর্গার মত সোহাগী হব।
দুর্বার মত নত হব।
ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১৫০)

লৌকিক পুরাণের আদর্শ নারীদের মতো গুণ, ব্যক্তিত্ব ও সতীত্বের মহিমাকে ধারণের আকাঙ্ক্ষা সনাতন বাঙালি নারীসমাজের পরম কামনা। সেখানে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৌশল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, দুর্গা প্রমুখ চরিত্র ও দেবদেবী লোকমানসে আদর্শস্থানীয় হিসেবে বিবেচিত। স্মর্তব্য, বাঙালি নারীর গৃহবধূরূপী ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণরাশির সমাহার উপর্যুক্ত দেবদেবী চরিত্রে আরোপিত হয়েছে লোকসমাজের নিজস্ব ঐতিহ্য-অভিরুচি, বহিরাগত সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রহণ-বর্জনগত মিথস্ক্রিয়ার অভিঘাতে। তাই বাঙালি নারীর কল্পনায় এসব চরিত্র অনুসরণযোগ্য মর্যাদা পায় কাঙ্খিত বিভিন্ন মানবিক গুণ আয়ত্ত করার আগ্রহে।[১৬]

সতিন বেটি মেকুড়ি। ...
ময়না, ময়না, ময়না
সতিন যেন হয় না।
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি
সতিন মাগী টেরী!
পাখি, পাখি, পাখি!
সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি।
বঁটি, বঁটি. বঁটি!
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আলতা পরি। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৩৮)

বহুবিবাহের বিড়ম্বনাদায়ক পরিণতি হিসেবে সপত্নী প্রথা বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে যে বহুলাংশেই কলঙ্কিত করেছিল, এর ইঙ্গিত রয়েছে এ ব্রতের আলপনায় অঙ্কিত বিভিন্ন নকশায়। পাশাপাশি ব্রতটির কিছু ছড়ায়ও প্রকাশিত হয়েছে নারীমনস্তত্ত্বে সন্নিহিত ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা। সতীনের মতো শত্রুর কবল থেকে নিস্তার পাবার প্রত্যাশাও বাঙালি নারীর একান্ত অভিপ্রায়। তাকে নিয়ে যেন সংসার করতে না হয়, এরূপ ভাবনার পাশাপাশি যে কোনোভাবে তার অনিষ্ট সাধন গৃহবধূর অভিলাষ। যে সমস্যার সমাধান করা নিজের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তা বাস্তবায়নের অভিলাষ এভাবেই বাঙালি গৃহবধূকে উদ্বুদ্ধ করে ব্রত পালন ও আলপনার মতো লৌকিক ধর্মাচারে।

১.৪.২

পূর্ব-বাংলার কুমারীদের মধ্যে মাঘমণ্ডলের ব্রতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষণীয়। এটি মূলত সূর্যের উপাসনাকেন্দ্রিক ব্রত। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এ ব্রত পালন করতে হয়। মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ বাঙালি নারীরা বাড়ির উঠানে ব্রতমণ্ডল সাজায়। সূর্যের বিয়ের বর্ণনার ছলে কুমারীরা নিজের বিয়ের জন্য রূপে, গুণে, মর্যাদায় সর্বোত্তম পুরুষকে স্বামী হিসেবে পাবার কামনা জানায়। এছাড়া কৃষি জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি, পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনা এবং সাংসারিক উন্নতিসাধনের জন্য এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই নারীরা শয্যা ছেড়ে পুকুরঘাটে বা নদীতীরে গিয়ে বসে ফুল নিয়ে। এরপর বয়স্ক একজন নারীর নির্দেশ অনুযায়ী তারা এ ব্রত বিষয়ক বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করে। এ পর্ব সম্পন্ন হলে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে তারা উঠানে আলপনা আঁকে। এ ব্রতের আলপনা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন–

> গৃহের সমস্ত আঙ্গিনা জুড়িয়া বিচিত্র আলপনা আঁকা হইয়া থাকে। ইহাদের পূর্বদিকে একটি বৃক্ষ ও পশ্চিমদিকে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকা হয় – ইহারা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র। ব্রতিনীগণ এই বৃত্তাকৃতি সূর্যের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া সূর্যবিষয়ক বিবিধ লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এক একটি নূতন বৃত্ত এখানে যোগ করিতে হয়, পাঁচ বৎসরে পাঁচটি বৃত্ত পূর্ণ হইলে ব্রত সাঙ্গ হয়। এই বৃত্তগুলি বিবিধ রঙিন গুঁড়া দিয়া সুরঞ্জিত করা হয়। চন্দ্রসূর্যের চিত্র ব্যতীত সেই আঙ্গিনার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যবহারিক বস্তু, যথা–আয়না, চিরুণী, দোলা, থালা, গ্লাস ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়। ... এই সকল চিত্রাঙ্কনে চাউল ও ইটের গুঁড়ি ও ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, –ইহাদিগদ্বারা যথাক্রমে সাদা, লাল ও কালো রং-এর কাজ চলিয়া থাকে। প্রতিদিন এই প্রকার চিত্রিত প্রত্যেকটি জিনিসের নিকট ব্রতিনী নানা ঐহিক বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেমন– চিরুণীর নিকট এই বর প্রার্থনা করে, 'আমি পুজি গুঁড়ির চিরুণী–আমার লাগি থাকে যেন সোনার চিরুণী।' আয়নার নিকট প্রার্থনা জানায়, 'আমি পুজি গুঁড়ির আয়না– আমার লাগি থাকে যেন আভের আয়না।' ... পৃথিবীর প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই সূর্য উর্বরতা বা উৎপাদন বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া কল্পিত হন, এখানেও বাংলার কুমারী কন্যাদিগের সূর্যের নিকট নানা ঐহিক বর প্রার্থনার মধ্যে যে তাহাদের মাতৃত্বেরও একটি সলজ্জ কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য আদিম সূর্যদেবতার সঙ্গে নারী, বিশেষত কুমারী নারীরই সম্পর্ক বেশী। (আশুতোষ, ১৯৬৩ : ৫৮৫-৫৮৬)১৭

১.৪.৩

লক্ষ্মী ব্রত বাঙালি গ্রামীণ নারীসমাজে বহুল সমাদৃত। আশ্বিন পূর্ণিমায় নতুন হৈমন্তী শস্য তোলার পর এ ব্রত পালিত হয়। সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজা পালিত হয়। এ ব্রতের প্রধান আলপনা হলো লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা ও ধানের ছড়া। লক্ষ্মীব্রত

বিশেষভাবেই কৃষিসংক্রান্ত ধর্মাচার। লক্ষ্মী হলো ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও সৌভাগ্যের দেবী। সকাল থেকেই উপবাসী নারীরা ঘরগুলোকে বিভিন্ন ধরনের পদ্মফুল, লতাপাতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা, ধানের ছড়া প্রভৃতির নকশা এঁকে সাজায়। শুধু তাই নয়, ধান-চাল ও শস্য, গার্হস্থ্য সামগ্রী রাখার ভাঁড়ারঘরে লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন–

> আলপনায় নানা অলংকার, এবং চৌকিতে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না লিখে, কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিম্বা পদ্মের উপরে পা এমনি নানারকম চিত্র দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধানছড়া, কলমীলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড় – ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁদুরের কৌটা আর এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। পাতিলখানির গাঁয়ে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ও ধানছড়া; উপরে লক্ষ্মীর সরা; সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে কালো এই কয় রঙে লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী-পেঁচা ইত্যাদির আলপনা। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদবর্ণ, কালির পরিরেখা এবং অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল; নীলবর্ণ পটভূমিকার কারুকার্য দেওয়া হয়। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১৬-১৭)

১.৪.৪

ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত ভাদুলি ব্রত বাংলার নারীসমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। মূলত বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্রত হিসেবে এর পরিচিতি রয়েছে। বর্ষাকাল পেরিয়ে প্রবাসী পরিজন যেন জলপথে ও স্থলপথে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, সেই কামনায় এ ব্রত করা হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "যে যুগে বাংলার সওদাগরগণ সমুদ্র ও নদীপথে গিয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিত, সেই যুগে এই ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে প্রবাসী পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আশীর্বাদ কামনা করিয়া নদী ও সমুদ্রের পূজা করা হয়। ভাদ্র মাসে এই ব্রত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদুলী।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬৩ : ৫৮৫-৫৮৬) ব্রতিনী ভাদুলির মূর্তি, জোড়া ছাতা, জোড়া নৌকা এঁকে, এর পর আলপনার মধ্যে নদী, সমুদ্র, কাঁটাবন, হিংস্র জন্তু, নৌকা ইত্যাদি এঁকে ব্রতটি পালন করে। বিভিন্ন কামনার প্রতিরূপ হিসেবে অঙ্কিত আলপনাগুলোতে ফুল ধরে সে সংশ্লিষ্ট ছড়া আবৃত্তি করে। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "ব্রতে ফুল ধরার অর্থ এ নয় যে নদীকে কি বাঘ মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্তিকে ফুল দিয়ে উপাসনা; নদীর কামনা শেষ, বনের কামনা শেষ এইটে মনে রাখবার জন্যেই ফুলটা;– কামনার প্রতিচ্ছবি আলপনায়; যেমন জলপথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আলপনায় ব্যক্ত হচ্ছে। এমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন 'নদী নদী! কোথায় যাও? বাপভায়ের বার্তা দাও।'

এই হল জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না।" [অবনীন্দ্রনাথ : ১৩৫০ (বঙ্গাব্দ) : ৯-১০] ব্রতী বিভিন্ন আলপনার চিত্রে তার কামনার প্রতিচ্ছবি বা ফুল ধরে ব্রতের ছড়া বলে।

নদী, নদী কোথা যাও?
বাপ ভায়ের বার্তা দাও।
নদী, নদী, কোথা যাও?
সোয়ামী শ্বশুরের বার্তা দাও।
সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে!
সাগর! সাগর! বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি।
একূল ওকূল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।
সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে
সাত ভাই আসে হেঁসে।।
ভেলা ভেলা সমুদ্রে থাকো।
আমার বাপ ভাইরে মনে রেখো। (আশুতোষ, ১৯৬৩ : ৬৩১-৬৩২)

এ ছড়ায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে নদী ও সমুদ্রে পরিভ্রমণকারী প্রিয়জনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ, তাদের বার্তা জানতে অধীর নারীমনের ব্যগ্রতা, শঙ্কা ও নিরাপদে গৃহে ফিরে আসার শুভকামনা।

১.৪.৫

লোকসমাজে পুণ্যিপুকুর ব্রত পালনের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনগত প্রতিকূলতা ও বিপর্যয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বৈশাখের দাবদাহে যখন মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়, জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায়, জনজীবনে হাহাকার সৃষ্টি হয়, তখন এর প্রতিকারার্থে বাঙালি গ্রামীণ নারী পুণ্যিপুকুর ব্রত করে। খরার প্রকোপে ভূ-প্রকৃতি, গাছপালা ও কৃষিজমির যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা রোধ করতে বৃষ্টিপাতের কামনাও এ ব্রতের ছড়ায় প্রকাশিত হয়। খরাকালে ঐন্দ্রজালিকভাবে ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে মাঠে ফসলের সমারোহ ঘটানোর আদিম কামনা এতে রূপায়িত হয়। এ ব্রতের অন্তর্গত বিভিন্ন আচারের মধ্যে রয়েছে পুকুর কেটে তাতে বেলের ডাল পোঁতা, এরপর পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করা, অবশেষে বেলের ডালে

ফুলের মালা সংযোজন ও পুকুরের চারদিকে ফুল সাজানো, অন্তিমলগ্নে নিচের ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল ধরা প্রভৃতি। পুকুর, বেলগাছ, জল, ফুল প্রভৃতি এ ব্রতের আলপনায় আঁকা হয়।

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভা'য়ের বোন পুত্রবতী
হয়ে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে ধরবে না।
ঢালি জল তুলসী বিল্বদলে,
স্বামী সোহাগিনী হব ফলে ফুলে।
পুণ্যপুকুরে ঢালি জল,
শ্বশুরকুলের হউক মঙ্গল। (শীলা, ২০০০ : ১৩১)

এ ব্রতের ছড়ায় শুধু প্রাকৃতিক বৈরিতার প্রতিকার ও পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলকামনা, স্বামীর সোহাগ ও সতীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ন থাকার বাসনাই প্রকাশিত হয় না। বরং পরিবার-পরিজন ও শ্বশুরকুলের মঙ্গল কামনা, স্বামীর ভালোবাসা লাভ ও সংসারের উন্নতি সাধন, পারিপার্শ্বিক জগত ও ইহলৌকিক জীবনের মঙ্গল কামনা প্রভৃতি এ ব্রতকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

১.৪.৬

গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে পুণ্যিপুকুর ব্রতের পাশাপাশি বসুধারা ব্রতও লোকসমাজে পালিত হয়। ধরণীকে বৃষ্টির জলে সিক্ত করা ও ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি, প্রকৃতির বুকে সজীবতা ও প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশায় এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। গ্রীষ্মের দাবদাহের চিত্র এ ব্রতের ছড়ায় রয়েছে, যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত হাহাকার ও জনজীবনের দুর্ভোগ বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে–

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু-শুকু, আকাশে ছাই। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৫৩)

ব্যক্তিবিশেষের বেদনা ও হাহাকার নয়, বরং দাবদাহের শিকার সকল মানুষের উদ্বেগ, বেদনা ও বিষণ্নতা এতে প্রতিফলিত। গঙ্গা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বাসুকী প্রভৃতি দেব-দেবীকে সম্মান জানিয়ে মা-বাবা ও শ্বশুরকুলের সমৃদ্ধি কামনা করে এ ব্রতের

ব্রতিনীরা। বসুন্ধরাকে সুজলা-সুফলা করার জন্যও এ ব্রত পালিত হয়। এভাবেই ব্রতিনীদের কামনা পরিণতিতে ব্যক্তিক-পারিবারিক কল্যাণকে ছাপিয়ে সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষায় সম্প্রসারিত হয়। পুণ্যিপুকুর ব্রতের আলপনায় আটটি তারা আঁকতে হয় এবং জলভর্তি একটি মাটির ঘটকে ছিদ্র করে বৃষ্টির অনুকরণে তুলসী, বট বা পাকুড় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, যেন মাটিতে জল পড়ে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ ব্রতের আচার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের নদী নালা খাল বিলের জল যখন শুকাইয়া আসে, তখন বৃষ্টি কামনা করিয়া আঙ্গিনার এককোণে তিনটি গাছের আল্পনা আঁকিতে হয়। একটি মাটির ঘট ফুটা করিয়া গাছের মাথায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির অনুকরণ করিয়া মেয়েরা বসুধাকে বারিধারায় সঞ্চিত করে এবং বৃষ্টির জন্য মিনতি জানায়। আটটি তারার আল্পনার উপর ফুল রাখিয়া ছড়া বলে।" (আশুতোষ, ১৯৬৩ : ৫৮৫-৫৮৬) তাঁর মতে, সাদৃশ্যমূলক জাদুর প্রভাব এ ব্রতের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। এ ব্রতের ছড়ায় বলা হয়–

অষ্টবসু, অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী
আটদিকে আটফল আমরা রাখি। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ১০)

ব্রতের মূল প্রসঙ্গ তথা ব্রতিনীর মুখ্য কামনা ফুটে ওঠে নিচের ছড়ায়–

বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে
মায়ের কুলে ফল বাপের কুলে ফল
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা।।
পৃথিবী জলে ভাসবে
অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে। (শীলা, ২০০০ : ১৩৪-১৩৫)

১.৪.৭

বাংলার গ্রামীণ নারীসমাজে আরো কিছু ব্রত প্রচলিত, যেগুলোতে আলপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন সামগ্রী ও অনুষঙ্গকে পাবার আকাঙ্ক্ষাবশত ব্রতিনী যেসব আলপনা আঁকে, তার বহিঃপ্রকাশ নিজস্ব ভঙ্গিমায় ছড়াতেও ঘটে। তেমনিভাবে সুবচনী ব্রতের আলপনাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুবচনীর ব্রতকথার প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন– "রাজার পুকুরে অনেক হাঁস। তার সর্দার ছিল এক খোঁড়া হাঁস। এক ব্রাহ্মণকুমার সেই খোঁড়া হাঁস মেরে খেয়েছিল এবং সুবচনীর কৃপায় তার মা সেই হাঁসকে বাঁচিয়ে তবে রাজার কোপ থেকে নিস্তার পেয়েছিল। এই গল্পটাকে দেখাচ্ছে এই সুবচনীর আলপনা।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৬৩) এটি সারাবছরই পালন করা যায়। সাধারণত বাড়িতে যে কোনো শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। শীলা বসাক জানিয়েছেন, এ ব্রতের আলপনায়

বাড়ির উঠানে চারকোণা একটা ঘরের পাশে চারজোড়া হাঁস ও খোঁড়া একটি হাঁস আঁকতে হয়। এরপর একটা জলভর্তি ঘট বসিয়ে এর ওপর আম্রপল্লব, আমসরা ও পদ্মফুল রাখতে হয়। যে নারী ভক্তিভরে সুবচনী ব্রত পালন করে, ইহলোকে তার কোনো বিপদ বা অমঙ্গল হয় না, এমনটিই ব্রতিনীর ধারণা। ইহলোকে সুখভোগ এবং পরলোকে স্বর্গলাভের প্রত্যাশাও এ ব্রত পালনের উদ্দেশ্য। (শীলা, ২০০০ : ১৬১-১৬৩) অন্যদিকে বছর শেষ দিনটিকে স্মরণ করে ব্রতিনীর অঙ্কিত পৃথিবী ব্রতের আলপনায় মর্ত্যজীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, পরিবার-পরিজন নিয়ে গার্হস্থ্য জীবনকে সকলের সঙ্গে উপভোগের আগ্রহ প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, "বছরের শেষে পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে পৃথিবী-ব্রতের এই যে আলপনাখানি,–নরনারীর জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস নিয়ে পদ্মপাতার উপরে একবিন্দুর মতো এই যে টলটল একটি সৃষ্টি–এটিকে তো কি পরিকল্পনার দিক দিয়ে, কি কারিগরির দিক দিয়ে মানচিত্র কিছুতে বলা যায় না।" (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৫৮)

রণে এয়ো ব্রত পালিত হয় বৈশাখ মাসে। যুদ্ধজয়ের কামনা, স্বামীর দীর্ঘায়ু ও গার্হস্থ্য জীবনের সমৃদ্ধি, পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও আজীবন সধবা থাকা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। এর আলপনায় নারীরা ধানের পুঁটলি, সিঁদুরের কৌটা, কাঁচা আম বা সুপুরির পুটলির ঘর এঁকে ছড়া আবৃত্তি করে–

রণে এও সনে যান,
আকালের ভাত সকালে খান।
সরু ধানে কালো পুতে,
জন্ম যায় যেন এয়োতীতে।।
একগঙ্গা গঙ্গাজলে, শুক্ল মল্লিকার ফুলে;
মরণ হয় যেন সোয়ামী পুত্রের কোলে।। (শীলা, ২০০০ : পৃ. ১৩৬)

মনসা ব্রতের ব্রতিনীরা সাপের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে মনসাদেবীর পূজা করে। এ ব্রতে আলপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়, যেখানে মূল নকশা হিসেবে মনসা দেবী ও সাপের প্রাধান্য থাকে। পুত্রহীনতা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা, শত্রু দ্বারা পরাস্থ হওয়া প্রভৃতি সমস্যার প্রতিকার কামনায় ব্রতিনী এ ব্রত পালন করে। এ ব্রতে আবৃত্তি করা হয় নিচের ছড়াটি–

অপুত্রকে পুত্র দেও
নির্ধনকে ধন দেও
রোগ শোক কর বিমোচনো।
মনসার শ্রীচরণ

যে জন করে স্মরণ
তার সব শত্রু হয় ক্ষয়।। (শীলা, ২০০০ : ৩৭৮)

পুণ্যঅর্জন ও পিতৃকুলের ধনসমৃদ্ধির কামনা জানিয়ে কুমারীরা কার্তিক মাসব্যাপী যমপুকুর ব্রত পালন করে। বাড়ির উঠানে এক হাত পরিমাণ চারকোণা পুকুর কেটে এর চারদিকে চারটি ঘাট করতে হয় এবং মাঝখানে কলমী, সুষনী, হিংচে, কুচ ও হলুদ গাছ লাগাতে হয়। পুকুরের দক্ষিণ ঘাটের ওপর মাটির তৈরি যমরাজা, যমরানী ও যমের মাসির পুতুল, উত্তর ঘাটে মেছো-মেছেনির পুতুল, পূর্ব ঘাটে ধোপা-ধোপানী, শেখ-শেখনীর পুতুল প্রভৃতি বসাতে হয়। পশ্চিমঘাটে কাক, বক, চিল, হাঙর, কুমির, কচ্ছপ প্রভৃতির তৈরি পুতুল জলে ভাসানো হয়। পুকুরের তীরে বসে যমরাজা, যমরানী আর যমের মাসিকে সাক্ষী রেখে ব্রতিনী নিচের ছড়া আবৃত্তি করে–

কালো কচু, সাদা কচু ল-ল করে, রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষীর শুকোর বিল, সোনার কৌটা রূপার খিল ॥
খিল খুলতে লাগলো ছড়, আমার বাপ-ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর, ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর ॥ (শীলা, ২০০০ : ১৬৪-১৬৫)

তারা ব্রত মাঘের সংক্রান্তির দিন শুরু হয়ে ফাল্গুন সংক্রান্তিতে পরিসমাপ্ত হয়। নারীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় উঠানের মাঝখানে চারকোণা একটি ছোট ঘর আঁকলেও সংক্রান্তির দুই দিন বড় করে চৌকো ঘর এঁকে এর ভেতরে ব্রতিনী তারা আঁকে। এ ব্রত পালনের মাধ্যমে স্বামী, সন্তান, ধন-সম্পদ ও চিরকাল এয়োস্ত্রী থাকার কামনা সে প্রকাশ করে। প্রকৃতিপূজার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতি ব্রতিনীর আন্তরিকতার প্রগাঢ় অনুভব প্রকাশিত হয় ব্রত ও আলপনার রীতিনীতি অনুসরণে। (শীলা, ২০০০ : ১৫৭)

গ্রামীণ বাঙালি লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প আলপনার স্বকীয় পরিচিতি রয়েছে মাঙ্গল্যচিত্র এবং রেখাচিত্র হিসেবে। নারীকেন্দ্রিক ও নারীচর্চিত এ লোকশিল্প সনাতন লৌকিক ধর্মাচার বা ব্রতের অংশ। তবে কালপরম্পরায় এর আবেদন ও ভূমিকা আধুনিক নাগরিক সমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনের শিল্পসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বর্ধনে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান অনুসরণের মাধ্যমে বিশেষ অভীষ্ট পূরণের পরিবর্তে নান্দনিক দিকটি মুখ্য বিবেচিত হওয়ায় মুসলমান সমাজও আলপনাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এভাবেই আলপনার ব্যাপ্তি ও ভূমিকা নতুনরূপে একালে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরেছে। তবে লোকসংস্কৃতির পাঠপরিক্রমায় ব্রতকেন্দ্রিক এ লোকশিল্পের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যবহ। কারণ মানবসভ্যতার বিবর্তনধারার বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য সন্নিহিত রয়েছে ব্রতের উদ্ভব ও উৎস, আলপনা ও ব্রতসংশ্লিষ্ট ছড়া, ব্রতকথা প্রভৃতিতে। প্রাত্যহিক জীবনে অপূর্ণ বিভিন্ন সাধ ও প্রয়োজনকে মেটানোর তাগিদে

প্রকৃতিনির্ভর অরণ্যাচারী কৌমজীবী মানুষ ধর্ম, জাদু, শিকার ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুশাসন, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে ব্রতের অবয়বে ধারণ ও লালন করেছে। এক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা সাংসারিক গণ্ডিতে তার ভূমিকা ও তৎপরতা বিশেষভাবেই পরিবারের লালনপালন, সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন, গার্হস্থ্য কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা ও বৈষয়িক উন্নতিসাধনকেন্দ্রিক। নারীর মনোলোকে পুঞ্জীভূত কামনারাশিকে ধর্মভাবনা, লোকাচার, ছড়া আবৃত্তি ও ছবি আঁকার মতো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশের তাগিদ থেকেই ব্রত ও আলপনার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নিছক ইহজাগতিক প্রয়োজন মেটানোর প্রত্যাশায় নয়, বরং নিত্যদিনের সংসারযাপনে সৃষ্ট একঘেয়েমি থেকে মুক্তিলাভ এবং চিত্তবিনোদনের তাগিদেও নারীসমাজ ব্রত ও আলপনাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। নারীর অন্তর্গত সংবেদনারাশি ও মনোভাবনাকে অনুধাবনে ব্রত, ছড়া ও আলপনার সমন্বিত উপযোগিতা তাই অনস্বীকার্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. রফিকুল আলম আলপনাকে 'ধর্মীয় নকশা' হিসেবে অভিহিত করেছেন (*উপমহাদেশের শিল্পকলা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫৪)। অন্যদিকে ওয়াকিল আহমদ মনে করেন হিন্দু নারী-সমাজের ব্রতানুষ্ঠান আলপনার প্রধান উৎস (*বাংলার লোকসংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬৪)। লালা রুখ সেলিম জানিয়েছেন, "আলপনা সৃষ্টি হয় দুটি উদ্দেশ্যে– একটিতে কামনা প্রাধান্য পায়, অন্যটিতে নান্দনিকতা। ব্রতের আলপনায় থাকে কামনার প্রাধান্য আর নান্দনিকতার প্রাধান্য থাকে বিয়ে, সমাবর্তন ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আলপনাগুলিতে।" [*চারু ও কারু কলা*, লালা রুখ সেলিম (সম্পা.), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৭৯] খগেশকিরণ তালুকদারের মতে, "আলপনা একান্তভাবে ব্রত শিল্প নয়, তবে মেয়েলী শিল্প অতি-অবশ্যই। ব্রতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত আদিম শিল্পপ্রকরণ; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঙালীর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত।" (*বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬-১৭)

২. প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮২

৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

> আলিপনাগুলি কেমন, তাই বলি, শিউলিফুল গাছের তলায় ছড়িয়ে আছে যেমন, আকাশের তারা মাথার উপরে ছড়িয়ে আছে যেমন, পারিজাত ফুলের মালা মাটিতে খসে পড়ে আছে যেমন, তেমনিভাবে আছে ঘরের আঙিনাতে পিঁড়ির পরে আলিপনা, এই সহজ শিথিল ভাবটুকুও হলো আলিপনার সৌন্দর্য। সেগুলি মোগল বাদশাদের দরবার গৃহের পাষাণ দেওয়ালে সযত্নে বসানো নানা পাথরের কারুকার্য নয় এটা ভুললে চলবে না। ... আলিপনা কথাটার মানেই হচ্ছে সখীপনা, শুভদিনে ডাক পড়ে পাড়ার

মেয়েদের আলিপনা ও সখীপনা করতে। ... সখীপনা করে একদল আলিপনা ছড়ায়, ফুল ছড়ায়, লাজ বর্ষণ করে সহজ আনন্দে। [*বাংলার ব্রত ও অন্যান্য ব্রত কথা*, বারিদবরণ ঘোষ (সংকলিত ও সম্পাদিত), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৩]

৪. ওয়াকিল আহমদের অভিমত–

আলপনা চিত্রকলার অঙ্গীভূত, আলপনার উৎস ব্রত। ব্রতের আলপনা ব্রতের কামনা অনুযায়ী চিত্রিত হয়। মূলে পল্লীর কুমারী বালিকা ও গৃহস্থ রমণীর মধ্যে ব্রতের আলপনা সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে এই ব্রতাচার ছিল, সেহেতু এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণ ছিল না। আলপনা ব্রত, ব্রতিনী ও ব্রতের স্থান ছেড়ে যখন কুলা, ডালা, পাটি, সিঁড়ি, দেওয়াল, ঘট ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়ল তখন মূলের ধর্মীয় প্রেরণা ও প্রবণতার বিষয় থাকল না, তা হয়ে উঠল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেগ ও আনন্দের বিষয়। এতে এক এক ব্রতের জন্যে নির্ধারিত চিত্র-মটিফ উঠে গেল; এক্ষেত্রে চিত্রবস্তুর নির্বাচনে শিল্পীর স্বাধীনতা এল। বিবাহের মত সামাজিক অনুষ্ঠানের উঠান, মেঝে, কুলা, ডালা ইত্যাদি চিত্রণে মুসলমান পরিবারেও আলপনা গৃহীত হল। গৃহস্থ রমণীরাই এর নির্মাতা। (*লোককলা প্রবন্ধাবলি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫০)

৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন–

আমাদের দেশে দু-রকমের ব্রত প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলছে যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত। এই মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারীব্রত–পাঁচ ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারীব্রত– বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। ... এই মেয়েলি ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয় ... এই ব্রতগুলিই অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের গঠন এইরূপ–– আহরণ, যেমন, ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ, যেমন, কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই। ... খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাঁদের চিন্তার, তাঁদের চেষ্টার ছাপ পাই। (*বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১-২)

৬. শীলা বসাকের অভিমত–

বাংলার ব্রতে নারীদেরই প্রধান স্থান। ভারতীয় পরিবার প্রথায় জননীর স্থান সর্বোচ্চে। সমগ্র পরিবার তার উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। পারিবারিক কল্যাণকামনার যাবতীয় দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে জননী, জায়া, ভগিনী নারীর চিরকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার কথা, আবদারের কথা জানা যায়। ... নানা উদ্দেশ্যে পারিবারিক ও সার্বিক মঙ্গলকামনায় বা উর্বরতাশক্তি

বৃদ্ধির জন্য, বৃষ্টির আবাহন কামনায় কিংবা অতিবৃষ্টি রোধের জন্য, অশুভ শক্তির হাত থেকে নিস্কৃতি বা রক্ষা পাওয়ার জন্য, রোগমুক্তির জন্য, পাপ স্খলনের জন্য নানা আচার পালন করে। আবার ব্রত পালনের ত্রুটি হলে ব্রতীর অমঙ্গলেরও আশঙ্কা থাকে। সংসারে সুখ ও শান্তি কামনাই বাঙালি নারীসমাজের মূল প্রেরণা। তাই বাঙালির সমাজজীবনে, বিশেষ করে নারীসমাজে ব্রত পালনের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ... বাংলার নারীরা ব্রতের মধ্যে দিয়ে স্বজন পরিজনের মঙ্গলকামনায় নিজেদের নিঃশেষিত করেছেন। বাঙালি নারীর জীবন, ধর্ম ও কর্ম বাধা রয়েছে বছর-মাস, দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র-সংক্রান্তি ইত্যাদির মধ্যে। তাই দেখা যায় বাংলার মেয়েলি ব্রতগুলি বিভিন্ন মাস, তিথি, তারিখ এবং নির্দিষ্ট দিন ও বার অনুযায়ী আচরিত হয়ে থাকে। (শীলা, ২০০০ : ১২২-১২৩)

৭. *উপমহাদেশের শিল্পকলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৮. *লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও সন্ধান*, বোনা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩১৪

৯. 'আলপনা' শব্দটিই আসলে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস-জাত : "আইল প্রস্তুত করা বা আইলপনা চিত্রদ্বারা সীমারেখা অঙ্কনের প্রথা থেকে আলপনা চিত্রের বিকাশ এবং দেশজ আইলপনা শব্দের উৎপত্তি। আইলের সীমারেখা দেওয়া বা বিশিষ্ট রেখাচিত্র দ্বারা শস্যক্ষেত, জনবসতি, গৃহ প্রভৃতি কুপ্রভাবমুক্ত করার আদিম জাদু বিশ্বাসগত প্রক্রিয়ার অঙ্গ রূপেই আলপনা শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ বলে অনুমিত হয়।" (দুলাল চৌধুরী, উদ্ধৃত, খগেশকিরণ তালুকদার, *বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬)

১০. খগেশকিরণ তালুকদারের অভিমত–

জীবন-সংগ্রামে নিরত মানুষের হস্ত ও মস্তিষ্কের, শ্রম এবং কৌশলের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিই বস্তুগত শিল্প অথবা ব্যবহারিক শিল্প। আর প্রকৃতির যে রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত, যে কৌশল অনাবিস্কৃত তার কাছেও মানবিক উদ্যম পরাভূত হতে রাজী নয়; আদিম মানুষ তাই, এক স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির জোরে, কল্পনার মায়াবী কৌশলে প্রকৃতিকে বশীভূত করতে উদ্যত। কল্পনায় প্রকৃতিকে বশীভূত করার মায়াবী কৌশলের নাম জাদুবিশ্বাস। জাদুবিশ্বাসের মূলে একটি ইপ্সিত বস্তু বা ঘটনা-সংঘটনের কামনা, কিন্তু সে কামনা চরিতার্থ করার বাস্তব উপায় সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন ইপ্সিত কামনার নকল সৃষ্টির মাধ্যমে, কল্পনায় সেই অজ্ঞতা পূরণের প্রয়াস এবং তাকেই যথার্থ বলে বিশ্বাস করা। বৃষ্টির কামনায় বৃষ্টির অনুকরণে নেচে, গেয়ে অথবা হরিণ শিকারের কামনায় হরিণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে, নাচ-গানের তালে তালে সংঘবদ্ধভাবে একে বর্শা অথবা তীরবিদ্ধ করে হরিণ শিকার যে অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ কি? নাচ, গান অথবা চিত্রাঙ্কন এখানে অবশ্যই বিনোদন নয়, অসহায় আদিম মানবের জীবন ধারণেরই উপায় এবং অবলম্বন (*বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০)

১১. *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ*, (বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পা.), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৮-৩৯

১২. এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্তের অভিমত–

এক একটি ব্রতের উদ্‌যাপন ক্ষেত্রে বিশেষ এক একটি নিজস্ব নকশার আলপনা আঁকা হয়। যেমন : লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের গোলা, ধানের শিষ, পেঁচা ইত্যাদি আঁকা হবে; আবার সুবচনী ব্রতে আঁকা হবে হাসের ঝাঁক, পুকুর-ব্রতের গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি হাঁসকে আবার খোঁড়া দেখাতে হবে; যমপুকুর ব্রতে আঁকতে হবে পুকুর, কচ্ছপ, কুমীর, মাছ, ধোপা ধোপানী, শেখ-শেখনী ইত্যাদি; সেঁজুতি ব্রতে আঁকা হবে ঠিক সেই সব জিনিসেরই ছবি যেগুলি মন্ত্রে উল্লেখিত, যেমন, গুয়া (সুপুরি), পান, দোলা, আর বাড়ি, গয়না ইত্যাদি। পদ্ম, সূর্য, নানা ধরনের লতার মোটিফ ইত্যাদি অবশ্য আলপনায় সব সময়েই ব্যবহৃত হয়। [*লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৪৬]

১৩. এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন–

মেয়েলী ছড়ার ... একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে ... ইহাদের একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে–সেই মূল্যটি ব্যবহারিক ও বাস্তব। ছেলে-ভুলানো ছড়াকে যদি লোক-সাহিত্যের রোমান্স বলিতে পারা যায়, তবে মেয়েলী ছড়াকে ইহার উপন্যাস বলিব; ... মেয়েলী ছড়ার প্রধান একটি অংশ ব্রতের ছড়া। বাস্তব জীবনের কল্যাণ ইহাদের লক্ষ্য বলিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। ... মানব হৃদয়ের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী লইয়াই উপন্যাস। ... মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে উপন্যাসের বীজ রহিয়াছে। [*বাংলার লোক-সাহিত্য*, (প্রথম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৩৯-১৪০]

১৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ জানিয়েছেন–

বাংলা ছড়াসাহিত্যে বাঙালীর জীবনধারার প্রতিচ্ছবিই প্রধান, অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তার পূর্বপুরুষের স্মৃতি। ক্রমবিকাশমান ছড়ার বিভিন্ন স্তরে যেহেতু মিশ্রিত হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের কামনা–তাই সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র ছড়ায় পাওয়া যায়। ... লোকছড়ায় সমাজচিত্র প্রতিফলনের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অধিকতর। কেননা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির পরিবর্তে যৌথভাবে জনসাধারণ এর রচয়িতা, ফলে সমাজের প্রতিনিধিত্ব এতে স্বভাবতই স্পষ্টতর। অন্যদিকে শত বছরেও লোকছড়ায় এত সামান্য পরিবর্তন ঘটে-যে তাতে অতীত স্মৃতির চিত্র প্রত্যক্ষভাবেই পাওয়া যায়। (*ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭)

১৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিম্বা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয় ... ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, ... এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি

যেখানে আমাদের পূর্বতন পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন ... একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে। ... এই সব অতিপুরাতন ব্রত এখনো কেমন করে বাঙালির ঘরে ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে সঙ্গে তো বদলে যায়নি। ... সেটা কাল, তার পূর্বে, এবং তার–তার-তারো পূর্বে যা, আজও তা। অন্তত বেশির ভাগ মেয়েলি কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির এবং ঠাকুরমা ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাত নেই। ... কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য নয়। বাংলার এই ব্রতগুলি আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্যব্রতচারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা;–– কখনো আলপনায় শিল্পে, কখনো কবিতা নাটক ও সাহিত্যকলার মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ : ৬-৮)

১৬. বরুণকুমার চক্রবর্তীর অভিমত–

আমাদের সমাজ জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব কি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তার বহুল নিদর্শন মিলবে ব্রতের ছড়া থেকে। এই দুটি মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র আমাদের সমাজ জীবনে আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল। তাই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে– আল্পনা পূজায়। (বরুণকুমার, ২০১০ : ২৩১)

১৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন–

পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের পল্লীগ্রামসমূহের অবিবাহিতা হিন্দু বালিকাদিগকে সূর্য-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। এই ব্রত মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ণ একমাস কাল ব্যাপিয়া করিতে হয়। স্থান ভেদে এই ব্রত 'সূর্যব্রত' 'লালঠাকুরের ব্রত' 'সিঁড়ি পূজা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য পার্বণাদির ন্যায় ইহাও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ... পল্লীর প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই একখানা করিয়া পূজার্থ তুলসী বৃক্ষ থাকে। সাধারণত এই তুলসীতলাতেই সিঁড়ি পূজার স্থান নির্বাচন করা হয়। তুলসীতলার প্রাঙ্গনখানা ভাল করিয়া লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা হয়। এই পুরস্কৃত স্থানের পুরোভাগে একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট নাতিবৃহৎ সিঁড়ি প্রস্তুত করা হয়– সম্মুখে একটি ছোট গর্ত করা হয়। উহার ভিতরটিও মাটি দ্বারা লেপিয়া সমান করা হয়– উহার নাম 'পুষ্করিণী'। এই পুষ্করিণীর সন্নিকটবর্তী স্থানে নানা প্রকার চিত্রাদি এবং আলিপনা অঙ্কিত করা হয়– সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে চাঁদ সূর্য, তিনকোণা পৃথিবী এবং মাঘমণ্ডল প্রভৃতি আঁকে। সিঁড়ির বামদিকে হাতি ঘোড়া, পুথি ঘাট প্রভৃতি এবং পুষ্করিণীর নিকটে শুয়া পক্ষী, বাজ পক্ষী, তেল-কলসী, ঘি-কলসী, বালা প্রভৃতি অঙ্কিত করে। সিঁড়ির উপরে এবং পুষ্করিণীর তীরবর্তী স্থানটুকুতেও নানাপ্রকার আলিপনা আঁকা হয়। শুষ্ক নিমপত্র চূর্ণ, আতপ-তণ্ডুল চূর্ণ, ইট-চূর্ণ এবং তুষ চূর্ণ এইগুলি নানা প্রকার রংয়ের কাজ করে এবং এইগুলি দিয়াই প্রধানত চিত্রাদি ও আলিপনা আঁকা যায়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ১০৩-১০৪)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অচিন্ত্য বিশ্বাস [সম্পা.], (২০১১)। *অদ্বৈত (মল্লবর্মণ) রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [১৩৫০ (বঙ্গাব্দ)]। *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, (২০১৪)। *লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও সন্ধান*, বোনা, কলকাতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য, (১৯৬২)। *বাংলার লোক-সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য, (১৯৬৩)। *বাংলার লোক-সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা

ওয়াকিল আহমদ, (২০০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা

কনকরঞ্জন দাস, (২০০৯)। *ব্রতপার্বণে বাঙালিসমাজ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

খগেশকিরণ তালুকদার, (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায়, [১৪০০ (বঙ্গাব্দ)]। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পল্লব সেনগুপ্ত, (২০০১)। *পূজা-পার্বণের উৎসকথা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

পল্লব সেনগুপ্ত, (২০১০)। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

প্রদ্যোত ঘোষ, (২০০৪)। *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বরুণকুমার চক্রবর্তী, (২০১০)। *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বরুণকুমার চক্রবর্তী [সম্পা.], (২০১২)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স কলকাতা

বারিদবরণ ঘোষ [সম্পা.], (২০১২)। *বাংলার ব্রত ও অন্যান্য ব্রত কথা*, দীপায়ন, কলকাতা

রফিকুল আলম, ২০০৩। *উপমহাদেশের শিল্পকলা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

লালা রুখ সেলিম, ২০০৭। *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

শীলা বসাক, ২০০০। *বাংলার ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, [১৩৯৫ (বঙ্গাব্দ)]। *ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা